গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা | ৩১ মার্চ - ৬ এপ্রিল ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

অথরিটিকে লঘু করার অর্থ জনগণকে নেতৃত্বহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া

শিবদাস ঘোষ

“গণতন্ত্র, অধিকার এইসব বড় বড় কথার আড়ালে অথরিটিকে কোনও ভাবে লঘু করার চেষ্টা হলে, তার অর্থ দাঁড়াবে বাস্তবে পার্টি নেতৃত্বের অবসান ঘটানো, পার্টি সংহতির অবসান ঘটানো, জনগণকে নেতৃত্বহীন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। অথরিটি বাদ দিলে মতাদর্শগত সংগ্রামকেও একটা খোলা ময়দানের তর্কাতর্কিতে পরিণত করা হবে, বিপ্লবী পার্টিকে একটা লক্ষ্যহীন বিতর্ক সভায় অধঃপতিত করা হবে।

সাতের পাতায় দেখুন

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক

কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

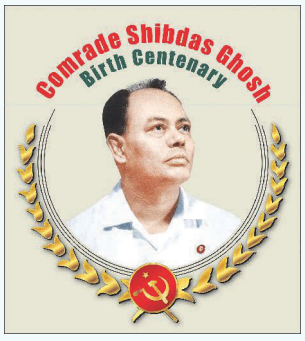

৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

অবাধ লুঠ চালাচ্ছে সরকার ও তেল কোম্পানিগুলি

কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী থেকে বিজেপির তাবড় নেতা, সকলের মুখেই শুনবেন, দেশে তেলের দাম কমানো যাচ্ছে না, তার কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম চড়া। সত্যিই কি তাই?

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ের ১৩৯ ডলার থেকে নামতে নামতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এখন ৭০ ডলার। অর্থাৎ অর্ধেক। অথচ ভারতীয় বাজারে সেই পুরনো দামই বহাল রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ধাপে ধাপে ক্রমাগত নামতে থাকলেও গত বছর মে মাস থেকে দেশের বাজারে দাম এতটুকুও কমানো হয়নি। তেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী গত বছরের মে মাসে ভারতের কেনা অশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১০৯.৫ ডলার। গত ২০ মার্চ তা নেমেছে ৭০.৬৯ ডলারে। অর্থাৎ গত বছর প্রতি লিটারে তার দাম ছিল ৫৩.৪৫ টাকা। এখন হয়েছে ৩৬.৬৮ টাকা (সূত্রঃ আ.বা.পত্রিকা, ২৩ মার্চ ’২৩)। অর্থাৎ শুধু অশোধিত তেলের দাম কমার কারণেই পেট্রল ও ডিজেলের দাম ১৬.৭৫ টাকা কমানো যায়। ফলে এ কথা স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক বাজারের দামের সঙ্গে ভারতের বাজারে তেলের বর্তমান দামের কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা এ বিষয়ে যা বলছেন তা সম্পূর্ণ অসত্য।

তা হলে কীসের কারণে দেশের বাজারে তেলের দাম এতখানি চড়া? এর কারণ একদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তেল কোম্পানিগুলির জন্য সীমাহীন লুঠের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, অন্য দিকে একই সঙ্গে প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকার, সাথে রাজ্য সরকারগুলির ভাণ্ডারেও ঢুকছে তেলের উপর চাপানো কর ও সেস থেকে বিপুল পরিমাণ আয়।

বেসরকারি কোম্পানিগুলি এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি কী ধরনের লুঠ চালাচ্ছে?

সংসদে কেন্দ্রীয় তেল প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলির দেওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, তেলের শুল্ক থেকে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে কেন্দ্রের আয় হয়েছিল ৪.৯২ লক্ষ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৪.৫৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০তে এই আয় ছিল যথাক্রমে ৩.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা এবং ৩.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ লকডাউনকে কেন্দ্র করে জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, যখন মানুষ ভেবে পাচ্ছে না সংসার চালাবে কী করে, তখন ২০১৯-২০-র থেকে পরের বছর এক লাফে অতিরিক্ত ১ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের ঘাড় ভেঙে তুলেছে। পরের বছর তা আরও বেড়েছে।

অথচ সরকার এই সময়ে অনায়াসেই তেলের দাম কমিয়ে জনগণকে কিছুটা রেহাই দিতে পারত। লকডাউনের কারণে এক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম শূন্যে নেমে যায়। স্ট্র্যাটেজিক অয়েল রিজার্ভের নামে ভারত সরকার সেই সময় কয়েক কোটি ব্যারেল অশোধিত তেল বিভিন্ন রাজ্যের রিজার্ভারগুলিতে জমিয়ে রাখে, যা পরবর্তী সময় ধরে বিপুল কর সহ চড়া দামে বিক্রি করে মুনাফা লোটে। দ্বিতীয়ত, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তলানিতে নেমে গেলেও সরকার বিপুল কর চাপিয়ে দেশের মানুষকে তারও কোনও সুবিধা পেতে দেয়নি। কিন্তু তারপর তেলের দাম সামান্য বাড়লেই সরকার ক্রমাগত কর বাড়িয়ে গেছে। বিশ্ববাজারে দাম কমলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিল চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ মার্চ এক প্রেস বিবৃতিতে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিলের ঘোষণাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলে অভিহিত করে বলেছেন, কংগ্রেস দলের সাথে আমাদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে, তবুও আমরা মনে করি, যে ভাবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিল করা হল তা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও সভ্যতাবিরোধী এবং প্রতিহিংসামূলক।

পার্লামেন্ট সচিবালয়ের তাড়াহুড়ো দেখে এ কথাই মনে হয় তারা যেন সুরাট কোর্টের রায়ের জন্যই কেবল অপেক্ষা করছিল।

জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, কুলতলির ৯ বারের বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ২৬ মার্চ সকাল ৬.১৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জয়নগরের দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্যসদনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

গত শতকের ৬০-এর দশকে কৃষক আন্দোলন, বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তিনি মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। হাইস্কুলের শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি এসইউসিআই(সি) দলে যুক্ত হন এবং ১৯৬৭ সালে কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার বিঘা বেনাম জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা হয়। বিধায়ক থাকা অবস্থায় তৎকালীন সিপিএম পরিচালিত সরকার সুন্দরবনে পরিবেশ বিনষ্টকারী বহুজাতিক সংস্থার ইকো ট্যুরিজম চালু করার চেষ্টা করলে তিনি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে তা প্রতিহত করেন। সুন্দরবনে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন।

ওই দিন দুপুরে তাঁর মরদেহ লেনিন সরণির রাজ্য অফিসে আনার পর নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যার্পণ করেন। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড মানিক মুখার্জী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। পলিটবুরো সদস্য ও কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, কমরেড অশোক সামন্ত, কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ এবং বহু কর্মী সমর্থক মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দও মাল্যদান করেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ সঙ্গীত ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উপস্থিত কমরেডরা তাঁকে বিদায় জানান। মরদেহ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পৌঁছলে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং তাপস রায়।

এরপর তাঁর মরদেহ জয়নগরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে শত শত মানুষ বারুইপুর, গোচরণ, দক্ষিণ বারাসাত, বহড়ু প্রভৃতি স্থানে গাড়ি থামিয়ে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। জেলা অফিসে কয়েকশত মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বারুইপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীর পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ

দুয়ের পাতায় দেখুন

নারীর মর্যাদা রক্ষার লড়াই আবার লড়তে হবে

মহিলাদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে এ বছর ভারত সরকারের সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক মর্মান্তিক রিপোর্ট। তাতে দেখা যাচ্ছে, বাংলার মেয়েদের বড় অংশের এখন ঘরকন্নাই একমাত্র সম্বল। এ রাজ্যের কিশোরী তরুণী-যুবতীদের প্রায় ৫০ শতাংশই এই শ্রেণিভুক্ত, যারা স্রেফ বাড়ির কাজ করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও লক্ষ্যণীয়ভাবে কম। নারীদিবসের প্রাক্কালে প্রকাশিত এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ, রোজগার কোনও কিছুর মধ্যেই না থাকা মেয়েদের হার অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় বেশি। কন্যাশ্রী প্রকল্পে থোক টাকা মেলায় অনেক মেয়েরই কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েদের হার পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি। ৪৫ শতাংশ মেয়েরই ২১ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি ছেলেমেয়েদের ২৯.৩ শতাংশ কোনও রকম পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ বা কাজকর্মের সাথে যুক্ত নয়। এদের মধ্যে মেয়েদের হার ৪৩.৮ শতাংশ, ছেলেদের হার ১৬.১ শতাংশ।

সম্প্রতি এক বিবাহিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে শ্বশুরবাড়িতে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল, যাতে সে পরীক্ষা দিতে না পারে। তার অ্যাডমিট কার্ডসহ বইয়ের ব্যাগ বাগানে ফেলে দেওয়া হয়। ওই পরীক্ষার্থী কোনও রকমে ঘর থেকে পালিয়ে থানায় যায় এবং পুলিশের সহায়তায় পরীক্ষা দেয়। আর একটি ঘটনা, এক বধূ পরপর দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় তাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে স্বামী। এ রকম ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে রাজ্যে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, অসম, ওড়িশার হাল আরও খারাপ।

নারী নির্যাতন, পণের জন্য চাপ এবং তার জেরে বধূহত্যা, ডাইনি সন্দেহে হত্যা, অ্যাসিড আক্রমণ, কন্যাভ্রূণ হত্যা, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এগুলি মারাত্মক ভাবে বেড়ে চলেছে। নারীদের অধিকার অর্জনের গৌরবময় লড়াইয়ের এত বছর পেরিয়ে এসেও ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী আজও পূর্ণ মানুষের মর্যাদা পেল না। নারীর উপর সংঘটিত অপরাধের নিরপেক্ষ তদন্ত, অপরাধীর শাস্তি— আজও অধরা। বিচারের বাণী কেঁদে চলেছে নীরবে নিভৃতে। উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনা তার নির্লজ্জ প্রমাণ। একটি দলিত তরুণীকে উচ্চবর্ণের চার দুষ্কৃতী ধর্ষণ করে এবং বীভৎস অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। তারপর পুলিশ রাতের অন্ধকারে বাড়ির লোকের অজান্তে মৃতদেহ পুড়িয়ে দেয় কোনও তদন্ত ছাড়াই। প্রমাণের অভাবে আদালত তিনজন জঘন্য অপরাধীকে বেকসুর খালাস করে দেয়। গুজরাটে ২০০২ সালের গণহত্যার সময় বিলকিস বানোকে যারা গণধর্ষণ করেছিল, তার তিন বছরের শিশুকন্যাকে বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাথরে আছড়ে হত্যা করেছিল, পরিবারের অন্য ৭ জনকেও হত্যা করেছিল, সেই ১১ জন নরপিশাচকে ২০২২-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব'-এর সূচনার দিনে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, তাদের গলায় মালা পরিয়ে মিষ্টি খাইয়ে সংবর্ধিত করে শাসক বিজেপির লোকেরা! আজও আমাদের দেশে মেয়েরা কর্মস্থলে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারেন না। তাদের নানা রকম যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়, যা তারা মুখ ফুটে বলতেও পারেন না কাজ চলে যাওয়ার ভয়ে। একই কাজের জন্য বহু ক্ষেত্রে পুরুষের সমান মজুরি দেওয়া হয় না মেয়েদের। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মহিলা কর্মী যাঁরা আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কিংবা মিড-ডে মিল, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নামমাত্র পারিশ্রমিকে কঠোর পরিশ্রম করানো হয়। সেই স্বল্প পারিশ্রমিকও সময়মতো দেওয়া হয় না। চলে নানা জুলুম শোষণ।

এ শুধু ভারতের চিত্র নয়, বিশ্ব জুড়ে প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশেই নারীর সমানাধিকারের দাবি, মানুষের মতো বাঁচার দাবি উপেক্ষিত। খোদ আমেরিকাতেও অভিজাত মহিলারা, সাংসদরা, অভিনেত্রীরা পর্যন্ত 'মি টু' আন্দোলনে সামিল হয়ে তাঁদের উপর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন। 'নারীর নিরাপত্তা' কথাটা নেহাতই ঠুনকো হয়ে পড়েছে আজকের পৃথিবীতে।

নারীদের উপর বীভৎস নির্যাতন চলছে আফগানিস্তান, ইরান সহ আরও কিছু দেশে। যেখানে এই একুশ শতকেও শাসকের ফতোয়া অনুযায়ী নারীর লেখাপড়া, চাকরির অধিকার তো নেই-ই, এমনকি ঘরের বাইরে একলা বেরোনোরও অধিকার নেই। শত অত্যাচারের পরও স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের অধিকার নেই। মাথার চুল হিজাবে পুরো ঢাকেনি এই অভিযোগে ইরানের ২১ বছরের তরুণী মাহশা আমিনিকে প্রশাসন কী পাশবিক নির্মমতায় হত্যা করেছে গোটা বিশ্ব তা দেখে শিউরে উঠেছে। দেশে দেশে সচেতন মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। ইরানের স্বৈরাচারী সরকার সে দেশের বহু প্রতিবাদীকেও গ্রেফতার করেছে, প্রাণদণ্ড দিয়েছে। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ ইরানের কায়ুম শহরে আইন পড়া মেয়েদের শরীরে বিষপ্রয়োগ করা হচ্ছে। এই ভাবে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া, পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে চাইছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি।

ভারতেও কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার মেয়েদের বহু লড়াইয়ে অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিয়ে তাদের গৃহকর্মে আটকে রাখতে চাইছে। হিটলারের 'গো ব্যাক টু কিচেন' তত্ত্বের সার্থক রূপকার! কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক কূপমণ্ডুক চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটিয়ে তাদের শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করতে চাইছে। কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভসংস্কারের কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছে। বলছে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে পড়তে হবে রাম, হনুমান কিংবা শিবাজির সংগ্রামের কাহিনি। তার ফলে নাকি জন্মের আগে থেকেই গর্ভের সন্তান ভারতীয় সংস্কারে অভ্যস্ত ও দেশপ্রেমী হয়ে উঠবে! ভাবতে অবাক লাগে, আমরা কোন যুগে বাস করছি! জ্ঞান বিজ্ঞানের এত উন্নতির পরও এ রকম অবৈজ্ঞানিক ভাবনা সমাজকে কোন অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে চলেছে! 'গরব সে কহো হম হিন্দু হ্যায়' স্লোগান চিৎকার করে আওড়াচ্ছেন যাঁরা তারা ঋকবেদে বর্ণিত অম্ভৃণীর মতো নারী চরিত্রের খবরও রাখেন না— যে নারী দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন 'আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবতা রূপে বিচরণ করি'। নারী শুধু ঘরকন্না করবে, পতিসেবা করবে এবং সন্তানের জন্ম দেওয়াই তার একমাত্র কর্তব্য— এর বিরুদ্ধ স্বরের উল্লেখও রয়েছে। অম্ভৃণির এই সুক্তই ঋক বেদে দেবীসুক্ত নামে খ্যাত। হিন্দুত্বের ঝাঁঝালো আরক ভুলিয়ে দিয়েছে এ দেশে দর্শনচর্চা থেকে শুরু করে সর্বত্র নারীর চিন্তাভাবনা ও স্বকীয়তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। সেই নারী ধীরে ধীরে কী ভাবে অধিকার হারাল তা এক ভিন্ন আলোচনা।

হিন্দুত্ব এবং ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে আজকের হিন্দুত্ববাদীরা নারীকে আরও বেশি করে গৃহবন্দি করতে চায়। আসলে আজকের পুঁজিবাদ মরণোন্মুখ। নিজের বিকাশের রাস্তা নিজেই অবরুদ্ধ করে সে নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকায় উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির বাজার আজ সঙ্কুচিত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, উন্নত যন্ত্র কাজে লাগিয়ে অধিক উৎপাদন করা যাচ্ছে না, তাই মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা থেকে, সত্য জানার সুযোগ থেকে দূরে রাখ। কুসংস্কার, কূপমণ্ডুক চিন্তার বিস্তার ঘটাও। এ ছাড়া পুঁজিবাদের আজ আর বাঁচার রাস্তা নেই।

নারীসমাজ আজ শোষিত নিপীড়িত হচ্ছে দু'দিক দিয়ে। এক দিকে পুঁজিবাদের সঙ্কটে তার জীবন বিপর্যস্ত, অন্য দিকে পুরুষশাসিত সমাজের দমন-পীড়ন-অত্যাচার তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। নারীদেহকে পণ্য হিসাবে, ভোগের সামগ্রী হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে মেয়েদেরই। আর এই লড়াইতে প্রেরণা জোগাবে আঠারো-উনিশ শতক, বিশ শতকের গোড়ার দিকের তেজোদীপ্ত নারী আন্দোলনের উজ্জ্বল ইতিহাস। আঠারো-উনিশ শতাব্দীতে ইউরোপ আমেরিকার দেশে দেশে নারীরা, বিশেষ করে শ্রমজীবী নারীরা কাজের নির্দিষ্ট সময়, পরিবেশ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাস, শিক্ষার অধিকার, সর্বোপরি নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী জঙ্গি আন্দোলন করেছেন, রাজপথে দৃপ্ত মিছিল করেছেন, প্যারিসের আইনসভা ঘেরাও করেছেন, পেত্রোগ্রাদে দিনের পর দিন ধর্মঘট করেছেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলনে প্রবল বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

সেই আন্দোলনকে মান্যতা দেওয়ার জন্যই ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক নারীদিবস ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন। সম্মেলনে বিশ্বের ১৭টি দেশের ১০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা, রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন উপস্থিত ছিলেন। নারীদের অধিকার অর্জন আন্দোলনের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের ঘোষণা হয়েছিল। অধিকার অর্জনের সেই লড়াই থেকে প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ মানুষের মর্যাদা পাওয়ার দাবিতে আজ আবার সংগ্রাম গড়ে তোলার সময় এসেছে। সেই সংগ্রামে সামিল হতে হবে সর্বস্তরের নারীদের। পাশাপাশি নিজেদের যুক্ত করতে হবে মানবতার শত্রু পুঁজিবাদ উচ্ছেদের লড়াইতে। এছাড়া নারীমুক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়।

জীবনাবসান

আলিপুরদুয়ার জেলার খোয়াবডাঙা-২ গ্রামপঞ্চায়েতের পূর্ব নারারথলি গ্রামে এস ইউ সি আই (সি) কর্মী দুর্গাচরণ সরকার ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

চরম দারিদ্র ছিল তাঁর পরিবারের নিত্যসঙ্গী। অভাবের জন্য বছর-চুক্তির ভিত্তিতে বন্ডেড গৃহশ্রমিক হিসাবে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। গৃহশ্রমিকের জীবন থেকে মুক্ত হওয়ার পর নব্বইয়ের দশকে এলাকায় এস ইউ সি আই (সি)-র ছাত্র-যুব কর্মীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। নিজে লেখাপড়া না জানলেও সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলে ইংরেজি ও পাশফেল পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এ জন্য সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতে একাধিকবার আক্রান্ত হন। কংগ্রেস সহ অন্যান্য দল তাঁকে নানা ভাবে হেনস্থা করলেও তিনি কখনও মাথা নিচু করেননি। নানা প্ররোচনা ও প্রলোভনের হাতছানি উপেক্ষা করে সারা জীবন দলের কর্মকাণ্ডে সাধ্যমতো অংশ নিয়েছেন। পরিবারকেও দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি।

১১ মার্চ পূর্ব নারারথলি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে কমরেড দুর্গাচরণ সরকার স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদক শিশির সরকার, আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্য মৃণালকান্তি রায়, শম্ভু সরকার, হিল্লোল চক্রবর্তী, নিবারণ সরকার প্রমুখ তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড দুর্গাচরণ সরকার লাল সেলাম

কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের জীবনাবসান

একের পাতার পর

কান্তি নস্কর, রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড রবি বসু, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড মাদারালি নস্কর, ক্যানিং জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সর্দার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও বহু মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

পরদিন কুলতলির চুপড়িঝাড়াতে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়ার পথে বহু জায়গায় শত শত মানুষ সমবেত হয়ে চোখের জলে তাঁদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানান। চুপড়িঝাড়াতে এই সংগ্রামী জননেতাকে শেষবার দেখার জন্য যেন জনপ্লাবন ঘটে। কয়েক হাজার মানুষের লাল সেলাম ধ্বনির মধ্য দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড প্রবোধ পুরকাইত লাল সেলাম

চার বছরের ডিগ্রি কোর্স উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করবে

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকরী করা শুরু করল। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে 'কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক ফর আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম' অনুযায়ী চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের যে কথা বলা আছে তা কার্যকর করার উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গত ১৭ মার্চ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিঠি দিয়ে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও শিক্ষাবিদ ও ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদ করায় রাজ্য সরকার আপাতত 'ধীরে চলো' নীতি নেওয়ার কথা বলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯-এ খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রকাশ করার পর থেকেই এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ শুরু হয়। দেশের প্রথম সারির শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে শিক্ষক-অভিভাবক-ছাত্ররা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোনও প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে অতি দ্রুত তা কার্যকরী করতে ২০২০-র জুলাই মাসে এই নীতিকে চূড়ান্ত রূপদান করে এবং মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত হিসাবে ঘোষণা করে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষানুরাগী মানুষ দাবি তুলেছেন, রাজ্য সরকার এই শিক্ষানীতি এ রাজ্যে চালু করবে না বলে ঘোষণা করুক। শিক্ষা যেহেতু যুগ্ম তালিকায় আছে, রাজ্য সরকার চাইলে তা চালু না করতেও পারে। তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার বিকল্প শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য দুটি কমিটি তৈরি করে। ভাবখানা এমন, যেন তাঁরা জাতীয় শিক্ষানীতি মানেন না, তাই বিকল্প নীতির খোঁজ। পার্থ চ্যাটার্জী শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। তার রিপোর্ট কেউ দেখেনি। ব্রাত্য বসু মন্ত্রী হয়ে দ্বিতীয় একটি কমিটি করলেন। দেশ-বিদেশের অনেক নামডাকওয়ালা লোকজনকে তার সদস্য করা হল। কিন্তু কোনও বিকল্প নীতির সন্ধান তাঁরা পেলেন কি না, তা জানা গেল না। বারবার দাবি উঠলেও তাঁরা জনসাধারণকে তা জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশেষে ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ল রাজ্যে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করার ঘোষণায়। এই প্রথম স্পষ্ট হল, মুখে যাই বলুক, তৃণমূল সরকার আসলে জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতিরই পক্ষে এবং তা তাঁরা চালু করবেন। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন— কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের তত্ত্বটি মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা থেকে নকল করেছে। অথচ এই শিক্ষানীতির ছত্রে ছত্রে তাঁরা ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য ও তার শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষে সওয়াল করেছেন। অর্থাৎ একদিকে তাঁরা বিদেশ থেকে সুবিধামতো 'কপি-পেস্ট' করছেন, অন্যদিকে 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া', 'ভারতীয় ঐতিহ্য' ইত্যাদি বাণী হামেশাই আউড়ে যাচ্ছেন।

এই চার বছরের ডিগ্রি কোর্সে কী আছে তা বলার আগে আরও দুয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। জাতীয় শিক্ষানীতির ছত্রে ছত্রে এত ভালো ভালো কথা আছে যে, কেউ যদি খুঁটিয়ে না পড়েন তাহলে তাঁর মনে করার যথেষ্ট সুযোগ আছে যে এই শিক্ষানীতির মতো ভালো শিক্ষানীতি অতীতে কখনও আসেনি। যেমন চার বছরের ডিগ্রি কোর্সের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে— প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনন্য ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তাকে উৎসাহিত করা, যাতে তারা তাদের প্রতিভা এবং আগ্রহ অনুসারে জীবনের নিজস্ব পথ বেছে নেয় তার ব্যবস্থা করা, যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, বহুবিভাগ সমৃদ্ধ বিশ্বের জন্য একটি সামগ্রিক শিক্ষা দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। জাতীয় শিক্ষানীতির উপর বিভিন্ন আলোচনায় আমরা বারবার দেখিয়েছি এ সমস্ত কথা খুব বিভ্রান্তিকর, চালাকিতে ভরা এবং এগুলির ঠিক উল্টো কাজ করাই এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য।

নতুন এই ব্যবস্থায় কী আছে? উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কলেজে স্নাতক স্তরে (ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেলের মতো পেশাগত বিষয় ছাড়া) জেনারেল বা অনার্স পড়তে এতদিন তিন বছর লাগত। এখন থেকে অনার্স পড়তে গেলে চার বছর লাগবে। কিন্তু এছাড়াও অনেক কথা আছে। যেমন, কেউ এক বছর বা দুই সেমিস্টার পাশ করে যদি পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাহলে সে একটি সার্টিফিকেট পাবে, দুই বছর বা চার সেমিস্টার পাশ করে ছেড়ে দিলে তাকে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে, তিন বছর বা ছয় সেমিস্টার সম্পূর্ণ করে ছেড়ে দিলে সে স্নাতক ডিগ্রি পাবে। আর যে চার বছর বা আট সেমিস্টার পাশ করবে এবং তার সঙ্গে গবেষণা করবে, তাকে চার বছরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্নাতকের শংসাপত্র দেওয়া হবে এবং সেটাই পরিপূর্ণ অনার্স স্নাতক ডিগ্রি হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ তার গুরুত্ব সব থেকে বেশি হবে। তাহলে বাকি সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা বা কেবল স্নাতক ডিগ্রিধারীদের ভবিষ্যৎ কী হবে? অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থাপনার হাত ধরে চার ধরনের নাগরিক সৃষ্টির ব্যবস্থা হল।

আবার সব থেকে বেশি কৌলিন্যের শিরোপা নিয়ে যাঁরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোবেন তাঁদের অবস্থা দেখুন। তাঁদের হাতে থাকবে 'মাল্টিডিসিপ্লিনার' নামক গালভরা খেতাব। এর মানে হল, তাঁরা ছাত্রাবস্থায় প্রভূত স্বাধীনতা পেয়েছেন— যার বলে প্রথম বছর পাঠ্য বিষয়গুলির যে সংমিশ্রণ (কম্বিনেশন) তিনি পড়েছেন, দ্বিতীয় বছর আরেকটি কম্বিনেশন পড়েছেন, তৃতীয় বছর অন্য আরেকটি কম্বিনেশন। যেমন, প্রথম বছর হয়ত পদার্থবিদ্যা ও ফ্যাশান ডিজাইন, দ্বিতীয় বছর অর্থনীতি ও রসায়ণ, তৃতীয় বছর বাংলা ও মনস্তত্ত্ববিদ্যা, ইত্যাদি। অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়গুলির মধ্যে কোনও মিলমিশ নেই— সম্পর্কহীন, সংযোগমুক্ত কিছু বিষয়, যার মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান গড়ে ওঠার কোনও সুযোগ নেই, যা বিদ্যার্থীর মনে যুক্তিবাদী মানসিকতা, মননশীলতার বিকাশে কোনও সাহায্য করবে না। খুব স্বাভাবিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে বিষয়ের কম্বিনেশন নিলে নম্বর বেশি উঠবে তাই নেওয়ার প্রবণতা কাজ করবে। তাতে হয়ত নম্বর বেশি উঠবে, কিন্তু জ্ঞান অর্জন হবে কি? এঁরাই হবেন বিজেপি-র দাবি অনুযায়ী তাঁদের পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ফসল! পড়ুয়াদের পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের এমন অদ্ভুত স্বাধীনতা প্রদানকে তাঁরা বিদ্যার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বলছেন এবং দাবি করছেন এমন ব্যবস্থা নাকি এর আগে কোনওদিন হয়নি। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় বিদ্যার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার যে ধারণা আছে, তার সঙ্গে বিজেপি-আরএসএস-এর মস্তিষ্ক প্রসূত এই পরিকল্পনার কোনও সম্পর্ক নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে তাঁদের অমানুষ করার এটা এক গভীর ষড়যন্ত্র। প্রশ্ন হল, এতগুলো কম্বিনেশনে পড়ে তিনি কোন বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি পাবেন? পরবর্তী সময়ে যখন তিনি গবেষণা করবেন, তখনই বা তিনি কোন বিষয়ে করবেন?

আর একটি বিষয় আছে যা আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর মনে হলেও উচ্চশিক্ষায় যতটুকু শৃঙ্খলা আছে তাকে বিপর্যস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তা হল 'মাল্টিপল এন্ট্রি' ও 'মাল্টিপল এক্সিট' এবং 'অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট'। এর অর্থ হল, একজন ছাত্র এক কলেজে কিছুদিন পড়ে ক্রেডিট সংগ্রহ করে সেই কলেজ ছেড়ে আর এক কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। সেখানে কিছুদিন পড়ে ক্রেডিট সংগ্রহ করে আর এক জায়গায় ভর্তি হতে পারবেন। এমন করে যাওয়া-আসা করতে করতেই চার বছরের কোর্স সর্বোচ্চ সাত বছর সময়ে সম্পূর্ণ করতে পারবেন। মাঝের বছরগুলোতে যে ক্রেডিট অর্জন করবেন তা ওই অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিটে জমা হতে থাকবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রেডিট সংগ্রহ হলেই তিনি ডিগ্রি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। সারা দেশের যে কোনও কলেজে তিনি ভর্তি হতে পারবেন। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, কোনও ছাত্র নতুন কোনও অনামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বছর পড়ে দ্বিতীয় বছর কলকাতা, যাদবপুরের মতো কোনও সামনের সারির বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবেন। তা নির্ভর করবে আসন খালি থাকা, না-থাকার উপর। প্রশ্ন হল, তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাবেন?

এখানেই শেষ নয়। এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নয়, পড়ুয়াদের মধ্যে কাজের দক্ষতা বা স্কিল সৃষ্টি করা। তার জন্য ওই শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে স্থানীয় শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বা হাতের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের কাছে ইন্টার্নশিপ করতে পাঠানো হবে। তাতে নাকি তাদের শিক্ষান্তে চাকরি পাওয়ার যোগ্যতার বিকাশ হবে। লাখ লাখ গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার যেখানে বেকার, সেখানে এই স্কিল দিয়ে চাকরি পাওয়া সুবিধা হবে? রসিকতারও একটা সীমা থাকা উচিত!

পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর, ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে মধ্যযুগীয় ভাবধারার জাবর কাটা, অনলাইন-দূরশিক্ষা-অফলাইন-হাইব্রিড বা মিশ্র পদ্ধতি যে কোনওভাবেই বিদ্যার্জনের সুযোগ— এই হল নতুন ব্যবস্থার অভিনব আরও কিছু দিক। এত কিছুর সারমর্ম হল, এই স্নাতক কোর্স চার বছরের। তার মধ্যে যে কোনও বছরে ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে এবং তদনুযায়ী সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। খেয়াল-খুশি মতো কলেজ ছেড়ে দিয়ে অন্য যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যাবে। প্রতি বছর পাঠ্য-বিষয় পরিবর্তন করা যাবে। এমন আজগুবি ব্যবস্থাকে তাঁরা নজিরবিহীন বলে দাবি করছেন! আসলে এমন 'স্বাধীনতা'র ধাক্কায় 'শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা'র নামে শিক্ষার্থীদের কেরিয়ারে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হবে, সেটাই হবে নজিরবিহীন। কিছু না-শেখা, না-জানা, নম্বরসর্বস্ব এক শ্রেণির অনার্স ডিগ্রিধারীর জন্ম হবে, যাঁরা না পাবেন চাকরি, না পারবেন স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হতে, গবেষণা করার যোগ্যতাও কার্যত তাঁদের থাকবে না। অন্যদিকে স্নাতক স্তরের কলেজ ও অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ভর্তির অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে। কারণ কোন ছাত্র কখন ভর্তি হবে এবং কখন ছেড়ে যাবে তার নিশ্চয়তা থাকবে না। তার উপর চার বছরের জন্য যে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন হবে তা কোথা থেকে আসবে, তার আর্থিক দায়িত্ব কে নেবে, সে ব্যাপারে কলেজগুলি খুবই শঙ্কিত। আমাদের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে পুরোপুরি 'নেই-রাজ্যে' এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। ফলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রুত অস্তিত্ব-সংকটের সম্মুখীন হবে। সরকার পোষিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে ঝুলবে বিলুপ্তির অশনিসংকেত। অভিভাবকরা দৌড়বেন তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে মহার্ঘ বেসরকারি কলেজের আঙিনায়। শিক্ষার বেসরকারিকরণের জন্য প্রস্তুত থাকবে লাল-গালিচা অভিবাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা বিকাশের (!) এমন রঙিন বিজ্ঞাপন আগে কেউ কখনও দেখেছেন?

এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ দেখে ২৫ মার্চ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, চার বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু করার আগে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে কমিটি করবে। সেই কমিটি খতিয়ে দেখবে, এই নীতি চালু করার সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলি, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর দপ্তর থেকে ১৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো চিঠিতে ইউজিসি-র নির্দেশ অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন মুখে অন্য কথা বলার অর্থ কী? মন্ত্রীর মুখের কথায় সরকার চলে না, চলে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান কী, যে দুটি কমিটি সরকার গঠন করেছিল তার রিপোর্ট কী— তা জনসাধারণের জানার অধিকার আছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামোর জন্য টাকা দিলেই মাল্টিপল এন্ট্রি ও এক্সিট বা মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্সের মাধ্যমে সুসংহত জ্ঞান গড়ে ওঠার পথে যে বাধা সৃষ্টি হবে তা কি দূর হবে? আসলে ওই ঘোষণার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকরা যে ভাবে প্রতিবাদ করছেন, বিশেষ করে সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটি যেভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে, সাংবাদিক সম্মেলন করে, কলকাতা সমেত রাজ্যের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ২৪ মার্চ নির্দেশিকার প্রতিলিপি পুড়িয়ে যেভাবে বিক্ষোভ হয়েছে, তার তীব্রতা সরকারকে চিন্তায় ফেলেছে। এই অবস্থায় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই শিক্ষামন্ত্রী এই কথা বলেছেন।

এই প্রতিবেদনের উপসংহার হিসাবে যা লেখা যায় তা হল, অনেক লুকোচুরি করে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র চ্যাম্পিয়ন (!) দল তৃণমূল বিনা প্রতিবাদে এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি হুবহু চালু করার কাজ শুরু করল। যে ব্যবস্থা তারা চালু করতে চাইছে তাতে স্নাতক স্তরের শিক্ষা প্রহসনে পরিণত হবে। শিক্ষা-বিবর্জিত স্নাতক তৈরির কারখানায় পর্যবসিত হবে বর্তমান কলেজগুলি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎও অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের রাস্তা আরও সুগম হবে। সরকার পোষিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হবে। বোঝা গেল, মুখে বিজেপির বিরুদ্ধে যতই শ্লোগান দিক, শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করার স্বার্থে বিজেপি-তৃণমূলের আসলে কোনও পার্থক্য নেই। ভোটের মঞ্চে বিজেপি-বিরোধী কংগ্রেস এমনকি বহু ক্ষেত্রে সিপিএম-ও শিক্ষার প্রশ্নে এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই চলছে।

শহিদ ভগৎ সিং স্মরণ

২৩ মার্চ শহিদ এ আজম ভগৎ সিং-এর ৯২তম আত্মোৎসর্গ বার্ষিকীতে সারা ভারতেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস সহ নানা গণসংগঠন ও ফোরাম। ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর মূর্তিতে মাল্যদান, শহিদ বেদি স্থাপন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

হরিয়ানা ঃ ২৩ মার্চ হরিয়ানার ভিওয়ানিতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও বুক স্টলের আয়োজন করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। বহু ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

রাজস্থান, মহারাজা কলেজ

পশ্চিমবঙ্গে আইনজীবীদের উদ্যোগ ঃ ২৩ মার্চ স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার মহান বিপ্লবী শহিদ ই আজম ভগৎ সিং-এর আত্মবলিদান দিবসে কলকাতা হাইকোর্ট সহ রাজ্যের কিছু কোর্টে শ্রদ্ধা জানানো ও শপথবাক্য পাঠ করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টে, পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশিষ্ট আইনজীবী আনসার মণ্ডল সহ বহু আইনজীবী ও ল-ক্লার্ক মাল্যদান করেন। বারুইপুর কোর্টে বিশিষ্ট আইনজীবী সামাদ সাহেব মাল্যদান করে বক্তব্য রাখেন। আলিপুর পুলিশ কোর্ট সহ বিভিন্ন কোর্টে ও আইনজীবীদের উদ্যোগে এলাকায় ও বাড়িতে বাড়িতে শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুষ্ঠান হয়। আসানসোলে ভয়েস অফ হিউম্যানিটির পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মেধা তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন

সকল বৈধ মেধা তালিকাভুক্ত চাকরি প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য পদক্ষেপ সহ বিভিন্ন দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন জানিয়ে হাজার হাজার পোস্টকার্ড পাঠানোর কর্মসূচি ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে চালিয়ে যাচ্ছে এআইডিওয়াইও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

কলকাতার বেলেঘাটায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন যুব কর্মীরা

কলকাতা ঃ ২৫ মার্চ কলকাতার বেলেঘাটা সিআইটি মোড়ে পোস্টকার্ডে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। তারপর বেলেঘাটা ডাকঘরে পোস্ট করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়ন্ত জানা।

বেলদা ঃ ২২ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে মুখ্য ডাকঘরের সামনে সংগঠনের দক্ষিণ জেলা সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে চলে স্বাক্ষর কর্মসূচি। বহু মানুষ দাবি সম্বলিত পোস্টকার্ডে স্বাক্ষর করে পোস্ট করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মলয় পাল, জেলা সম্পাদক সুশান্ত পানিগ্রাহী, শঙ্কর ঘাঁটি, মনোরঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ।

কাঁথিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

কয়লার দাম কমায় বিদ্যুৎ-এর দাম অন্তত ৫০ শতাংশ কমানো, অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের মতো এ রাজ্যে কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্ধও খারাপ মিটার অবিলম্বে পরিবর্তন, নতুন কানেকশন দেওয়ার নিয়ম সরলীকরণ প্রভৃতি দাবিতে এবং জনস্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০২২ এর বিরুদ্ধে, জোর করে স্মার্ট প্রিপেড মিটার চালুর প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার মারিশদা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির উদ্যোগে ২২ মার্চ গ্রাহক সম্মেলন এবং ওই সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজার অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের স্থানীয় কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন দাস, সভাপতি শ্যামাপদ আদক ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা অফিস সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, জেলা নেতা সনাতন গিরি প্রমুখ।

স্টেশন ম্যানেজার স্মারকলিপি গ্রহণ করে স্থানীয় দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন। সম্মেলনে শ্যামাপদ আদককে সভাপতি, পঞ্চানন দাসকে সম্পাদক করে ৩৩ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

স্কুলেই ধর্ষিতা ছাত্রী, বিক্ষোভ মালদায়

এ রাজ্যে মেয়েদের নিরাপত্তা কতটা বিপন্ন তা দেখিয়ে গেল মালদার গাজোলের ঘটনা। সেখানে ফতেপুর জুনিয়র হাইস্কুলে ১৮ মার্চ স্কুল চলাকালীন ষষ্ঠ শ্রেণির এক নাবালিকা ছাত্রী স্কুলের মধ্যেই গণধর্ষণের শিকার হল। ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে এবং ঢালাও মদ ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও এবং এ আই এম এস এস-এর যৌথ উদ্যোগে মালদা শহরের রথবাড়িতে ২১ মার্চ বিক্ষোভ দেখানো হয়। বক্তারা ক্ষোভের সাথে বলেন, একজন ছাত্রী তার নিজের স্কুলেই নিরাপদ না হলে কোথায় নিরাপত্তা পাবে? রাজ্য সরকারের ঢালাও মদ বেচার নীতি সমাজে কতটা ঘুণ ধরিয়েছে এ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাস পরিষেবার দাবি আদায়

দক্ষিণ কলকাতার শরৎ বসু রোড ধরে কিছুদিন আগেও চলাচল করত অনেকগুলি রুটের বাস। কিন্তু করোনা অতিমারির পর থেকে ৩সি/২, লেক রোড-হাওড়া মিনি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ মিনিবাস পরিষেবা দীর্ঘদিন বন্ধ। এই রুটগুলির বাস পরিষেবা অবিলম্বে চালুর দাবি সহ একাধিক পরিবহণ সমস্যা নিয়ে ৯ মার্চ পাবলিক ভেহিকেল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে এলাকার তিন শতাধিক মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র দিল 'দক্ষিণ কলকাতা জনস্বার্থ রক্ষা মঞ্চ'। এই দাবিপত্রে বেশ কয়েকদিন ধরে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন তাঁরা। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সম্পাদিকা স্বাতী দত্ত, শিবাজী দে, সন্দীপ দত্ত, দিলীপ চ্যাটার্জী, নিমাই দে, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (মিঠু) প্রমুখ।

২৫ মার্চ আরটিএ-র পক্ষ থেকে এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে কমিটিকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, অবিলম্বে এই বাস রুটগুলি চালুর জন্য তারা নির্দেশ জারি করছে।

বাইক ট্যাক্সি চালকদের সম্মেলন

বাইক ট্যাক্সিকে কমার্শিয়াল লাইসেন্স দেওয়ার নোটিফিকেশন কার্যকর ও বাইক ট্যাক্সি চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি প্রদান সহ নানা দাবিতে ২০ মার্চ, কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে।

সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়। তারপর সম্পাদকীয় রিপোর্টের মধ্য দিয়ে বাইক ট্যাক্সি চালকদের লড়াইয়ের কথা ও আন্দোলনের জয়ের বিষয়টি এবং আগামী দিনে আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে তা নিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়।

সম্মেলনে দুই শতাধিক বাইক ট্যাক্সি চালক প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। উপস্থিত ছিলেন নিরঞ্জন নস্কর, সমর সিনহা, অনিন্দ্য রায়চৌধুরী প্রমুখ। সম্মেলন থেকে কমরেড শান্তি ঘোষকে সভাপতি ও কমরেড দেবু সাউ-কে সম্পাদক করে ৪৩ জনের কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির প্রথম কর্মসূচি হিসেবে ২৩ মার্চ শহিদ ই আজম ভগৎ সিং-এর স্মরণদিবস সকল জোনাল কমিটি সহ কেন্দ্রীয় অফিসে উদযাপনের ঘোষণা করা হয়।

আর্থিক সঙ্কটের অবসান চায় মানুষ
ব্যাপক বিক্ষোভ লেবাননে

দিনের পর দিন আর্থিক সঙ্কট। খাবার, জ্বালানি এমনকি ওষুধের দামও নাগাল ছাড়িয়েছে। এদিকে ব্যাঙ্কে যেটুকু টাকা সঞ্চিত আছে, সরকারি হুকুমে তাতেও প্রয়োজন মতো হাত দেওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভে ফুঁসছেন ভূমধ্যসাগরের তীরের ছোট্ট দেশ লেবাননের মানুষ। এর বিরুদ্ধে ২১ ও ২২ মার্চ পরপর দু'দিন রাজধানী বেইরুটে সরকারি দফতরগুলির সামনে প্রবল বিক্ষোভে সোচ্চার হলেন সেখানকার সাধারণ মানুষ।

নিরাপত্তা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের পেনসনজীবীরা এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন। ২২ তারিখ বেইরুটে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। রক্ষীরা ব্যারিকেড খাড়া করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। আগের দিন বিক্ষোভকারীরা রাজধানী শহরের বহু রাস্তা অবরোধ করেন। বন্ধ হয়ে যায় বেশ কিছু দোকানপাট। স্লোগান ওঠে— অবিলম্বে জিনিসের দাম কমাতে হবে, মেটাতে হবে জ্বালানি সঙ্কট। ধুঁকতে থাকা সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে হবে, খুলে দিতে হবে বন্ধ হয়ে থাকা স্কুলগুলি। উল্লেখ্য, গত জানুয়ারি মাস থেকে সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা বেতনের ন্যায্য বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করছেন। ধর্মঘটে সামিল তাঁরাও। সম্প্রতি সরকার বেতন সামান্য বাড়ালে ও যাতায়াতের খরচ মেটাতে রাজি হলে শিক্ষকদের একটি অংশ কাজে যোগ দেন। কিন্তু তাঁদের একটি বড় অংশ, বিশেষ করে যাঁরা চুক্তিতে কাজ পেয়েছেন, তাঁরা এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বন্ধ হয়ে রয়েছে দেশের অনেক স্কুল।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা জিইয়ে রাখতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা সদা সচেষ্ট। লেবাননের উপর বেশ কয়েক বছর ধরে তারা জারি করেছে নানা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা। পরিণতিতে বিশেষ করে গত চার বছর ধরে লেবানন ভুগছে প্রবল আর্থিক সঙ্কটে। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেখানকার ৮২ শতাংশ মানুষই আজ দারিদ্রের কবলে। ২০১৯ সাল থেকে মার্কিন ডলারের অনুপাতে লেবাননের মুদ্রা 'লিরা'র দাম পড়তে থাকে। বর্তমান ডলারের তুলনায় লিরার মূল্য ৯৮ শতাংশ পড়ে গেছে। ফল হয়েছে মারাত্মক। আমদানির উপর নির্ভরশীল এই দেশটির আমদানি-খরচ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। আমদানি করা খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের দাম ক্রমেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

সঙ্কটকে সাময়িক ভাবে সামাল দিতে লেবানন সরকারের সামনে একটি পথ খোলা রয়েছে। তা হল, সাম্রাজ্যবাদী আর্থিক সংস্থা আইএমএফ-এর কাছ থেকে ঋণ নেওয়া। আইএমএফ-ও টাকার ঝুলি নিয়ে তৈরি। কিন্তু ঋণের সেই টাকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহুজাতিক সংস্থাগুলির মুনাফার স্বার্থে তৈরি নানা কঠিন শর্ত। যেগুলি মানতে হলে লেবানন সরকারকে সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি আরও বেশি করে জলাঞ্জলি দিয়ে গোটা দেশের সমস্ত সম্পদের মালিকানা অবাধে তুলে দিতে হবে মুনাফাবাজ বহুজাতিকদের হাতে। ফলে দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের রোষের মুখে পড়তে হবে তাদের। তাই আইএমএফ-এর ঋণের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত লেবানন সরকার। এদিকে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠায় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে লেবাননের মানুষ। প্রতিকার চাইছে।

শুধু লেবানন নয়। দেশে দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আজ সঙ্কটে সঙ্কটে জর্জরিত। আইএমএফ বা কোনও সরকারের সাধ্য নেই তা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার। ক্রমবর্ধমান সমস্যা থেকে মুক্তির একটাই রাস্তা। তা হল শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে পরিকল্পনাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এটাই সময়ের দাবি, যা লেবাননের বিপর্যস্ত মানুষকে বুঝতে হবে। (তথ্যসূত্র ঃ পিপলস ডিসপ্যাচ, ২৩ মার্চ, '২৩)

কমরেড শিবদাস ঘোষ শতবর্ষে রাজ্য জুড়ে নানা কর্মসূচি

শ্রমিক সভা ঃ এআইইউটিইউসির পূর্বতন সভাপতি, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে কমরেড 'শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও বর্তমান সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি' বিষয়ক আলোচনা সভা ২২ মার্চ কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য (ছবি)। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরী ও জেলা নেতৃবৃন্দ। দুই শতাধিক মানুষ আলোচনা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষকদের সভা ঃ ২১ মার্চ উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকে সর্বহারার মহান নেতা এআইকেকেএমএস-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়। এই সভায় দুই শতাধিক কৃষক ও খেতমজুর অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস।

বরানগর ঃ ২৬ মার্চ কলকাতার বরানগরে যমুনা ভবনে দলের বরানগর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে 'ভারতের বামপন্থী আন্দোলন ও কমরেড শিবদাস ঘোষ' শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করা হয়। আলোচনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী।

তিনি বলেন, মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বামপন্থী আন্দোলনের সামনে যে গাইডলাইন রেখেছেন তা মেনে চললে আজকের বামপন্থী আন্দোলন বহু দূর এগিয়ে যেতে পারত। বামপন্থী আন্দোলনকে কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে নিয়ে যেতে হবে— এ ব্যাপারে তাঁর শিক্ষা অমূল্য। সভাপতিত্ব করেন কলকাতা জেলা কমিটি সদস্য কমরেড সাধনা রায়। দেড় শতাধিক মানুষ আগ্রহ সহকারে আলোচনা শোনেন

একই উদ্দেশ্যে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে সভা হয়।

শিবদাস ঘোষ উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

২৩ মার্চ আসানসোলের বিএনআর মোড়ে রবীন্দ্রভবনের বিপরীতে মহান মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর রচনা ও বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি প্রদর্শনী এবং বুক স্টলের আয়োজন করা হয় দলের আসানসোল লোকাল কমিটির উদ্যোগে। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী। কর্মসূচি শুরু হয় মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জীর বক্তব্য দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতৃবৃন্দ, বহু পার্টি কর্মী ও সাধারণ মানুষ।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে উত্তরভারতে কনভেনশনের প্রস্তুতি

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এআইডিএসও-র উদ্যোগে যে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে তারই অঙ্গ হিসাবে ২৯ মার্চ পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অনুষ্ঠিত হয় উত্তর-ভারত জোনাল কনভেনশন। এই কনভেনশনের সমর্থনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হিমাচল বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাতিয়ালা ক্যাম্পাস, রাজস্থানের মহারাজা কলেজ ও গঙ্গানগর কলেজ, গাড়োয়ালের হেমবতী নন্দন বহুগুণা কলেজ সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচার কর্মসূচি চালানো হয়।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের মতামত

সৌন্দর্যের আড়ালে যন্ত্রণার ছবি

ভোরের কুয়াশা ভেদ করে 'কু ঝিক ঝিক' আওয়াজ তুলে ছুটে চলা টয় ট্রেন, পাহাড়ের গায়ে সারি দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি, পাহাড়ি ঝরণা, চা-বাগানের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য, পাইন গাছের জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম আর শৈলসুন্দরী কাঞ্চনজঙ্ঘার টানে ফি বছর ভ্রমণপিপাসু মানুষ ভিড় জমায় দার্জিলিংয়ে। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড়ও লেগে থাকে এই পাহাড় চুড়ায়। পর্যটকদের হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানায় পাহাড়বাসী মানুষ। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় সব কিছু যেন ঠিকঠাক চলছে। কিন্তু এই হাসিমুখের বেড়াজাল পেরিয়ে একটু গভীরে উঁকি দিলে দেখা যাবে হাজারো কষ্ট, অভিমান, ক্ষত, আর যন্ত্রণার ছবি।

সমতলের মানুষজনের তুলনায় পাহাড়ের মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম যে কয়েক গুণ বেশি, অনুন্নয়নের খাত কত গভীর— পাহাড়ে না এলে তা অনুভব করা যেত না। ম্যাল থেকে অনতি দূরে ভুটিয়া বস্তিতে দেখা হয়ে গেল এক কলেজ ফেরত যুবক গৌরব গুরুং-এর সঙ্গে। তখন সবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামতে চলেছে। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে একে একে মানুষজন কাজ শেষে ফেরত চলেছে আপন ঠিকানায়। বয়সে অনেকটা ছোট হলেও গৌরবের সঙ্গে আলাপ জমাতে সমস্যা হল না। নর্থপয়েন্ট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের সমাজবিদ্যার ছাত্র গৌরবের থেকে জানলাম দার্জিলিং সদর মহকুমায় সরকারি কলেজ একটাই— 'দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ'। বাকি সবই বেসরকারি। যেখানে 'ফেল কড়ি মাখো তেলের' গল্প। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে অর্থের অভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কলেজ শেষ করে দার্জিলিংয়ে চাকরির সুযোগ নেই বললেই চলে। চাকরির খোঁজে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর কিংবা দেশের অন্য কোনও শহরে পাড়ি দিতে হয়। পাহাড়বাসী মানুষজনের কাছে এটা বেশ অস্বস্তিকর। কারণ তাঁদের জীবনযাপন সমতলের মানুষদের থেকে অনেকটাই আলাদা। সরকারি চাকরির সুযোগ পাহাড়ে খুবই কম।

দার্জিলিংয়ে শিক্ষিত যুবক যুবতীর কাছে জীবিকার সুযোগ বলতে পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত হোটেলে কর্মী হিসেবে যোগ দেওয়া, হাল আমলের সুইগি, জ্যোমাটোর খাবার ডেলিভারির কাজ কিংবা বড় রিটেল শপে সেলসের কাজ। অল্প কিছু জন সেনা কিংবা পুলিশে যোগ দেওয়ার সুযোগ পায়। বাকি সাধারণ মানুষের জীবিকা চাবাগানের শ্রমিকের কাজ, কৃষিকাজ, ভাড়ার গাড়ি চালানো, অল্প কিছু সংখ্যক পুরুষ মহিলা সন্ধ্যায় ফাস্টফুডের দোকান চালান কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান চালান। আলাপচারিতায় আরও জানতে পারলাম ইডেন হাসপাতালই (দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল) দার্জিলিংয়ের মানুষের কাছে একমাত্র বড় হাসপাতাল যা পাহাড়ের সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকে। এর বাইরে কার্শিয়াংয়ে একটি মহকুমা হাসপাতাল ছাড়া বাকি সব ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (বিপিএইচসি) কিংবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পিএইচসি)। বড় ধরনের অসুখের চিকিৎসার জন্য সাধারণ মানুষকে হামেশাই সমতলে শিলিগুড়ি যেতে হয়। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সরকারি দৈন্যের ছাপ স্পষ্ট। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও পাহাড়ের মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে সরকারের ব্যর্থতা প্রকট।

পানদাম যাওয়ার হাঁটা পথে এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে আলাপ হয় আশীষ মুখিয়া, রোশন থামিয়ার সাথে। তাদের কথায় জানতে পারলাম, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার সুবিধা পাহাড়ের সাধারণ মানুষের অনেকেই পান না। কারণ, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের অভাব। আবার অনেক সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে গিয়ে সরকারি অফিসে পোহাতে হয় বিস্তর ঝামেলা।

পানীয় জলের সংকটের কথাও আলোচনায় উঠে এল। প্রায় সারা বছরই পানীয় জল নিয়ে সমস্যা পোহাতে হয় স্থানীয় নাগরিকদের। গরমের সময়ে পানীয় জলের সংকট তীব্র। কার্শিয়াং থেকে কালিম্পং, ম্যাল থেকে মিরিক সর্বত্রই রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। পানদামের চা শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। সংগঠিত ক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও এঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের থেকে অনেক কম মজুরি পেয়ে থাকেন। অপুষ্টি অনাহার নিত্যসঙ্গী। এক দিকে সরকার আশ্বাস দিচ্ছে বন্ধ চা-বাগান নিজেরা অধিগ্রহণ করে চালাবে, অন্য দিকে পানদামের মতো সরকারি চা বাগান বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দিচ্ছে। অন্যান্য চা-বাগানের অবস্থাও একই। কোথাও কোথাও শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য থাকেন।

মিরিকে এক চায়ের স্টোরে আলাপ হয় ইস্মিতা তামাং-এর সাথে। ইস্মিতা কলেজ শেষ করে অন্য কোনও চাকরির সংস্থান করতে না পেরে এক রকম বাধ্য হয়েই চায়ের স্টোরে চাকরি নিয়েছেন। আদপে মেয়েটি মাংগারজং এর বাসিন্দা, মিরিকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। যা উপার্জন হয় তার বেশির ভাগ চলে যায় থাকা খাওয়ার খরচ মেটাতে। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ইস্মিতা।

গৌরব, আশীষ, রোশন, ইস্মিতার মতো এই প্রজন্মের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে মতপার্থক্য আছে। পাহাড় ও সমতলের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনেকেই বীতশ্রদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরেই এদের সাথে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বঞ্চনা করে চলেছে, এই বিষয়ে এরা সবাই একমত। স্বাধীনতার পর কেন্দ্র রাজ্যে অনেক রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে, পাহাড়ের রাজনীতিও এগিয়েছে জোয়ার ভাটার মধ্য দিয়ে, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি।

জিশু সামন্ত
খানাকুল, হুগলি

অবাধ লুঠ সরকার ও তেল কোম্পানিগুলির

একের পাতার পর

কিন্তু তারা দাম কমিয়ে মানুষকে রেহাই দেয়নি। অথচ বাজারে পেট্রল ডিজেলের চড়া দামই পরিবহণ খরচ বাড়াচ্ছে। যা সার্বিক ভাবে এবং বিশেষত খাদ্য সহ অত্যাবশ্যক পণ্যের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে।

বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলি কিংবা সরকার দেশের বাজারে তেলের চড়া দামের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের দামের যে দোহাই দেয় তা দেশের জনগণের সঙ্গে এক বিরাট প্রতারণা। এখন দেশের জন্য প্রয়োজনীয় তেলের ৮০-৮৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। বাকিটা দেশীয় খনি থেকে উত্তোলন করা হয়। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। আমেরিকা এবং ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি রুশ তেলে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে রাশিয়া অত্যন্ত কম দামে ভারতকে তেল দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। কত কম সেই দাম? রাশিয়া সেই সময়ে ৪০ ডলারে তেল দেওয়ার কথা ঘোষণা করে এবং জানায় তারা এমনকি এর থেকেও কম দামে ভারতকে তেল দিতে রাজি আছে। অর্থাৎ ভারত এখন ৪০ ডলারের থেকেও কম দামে তেল কিনছে রাশিয়া থেকে। এই অতি সস্তার তেল কী পরিমাণে ভারত আমদানি করছে, জানলে চোখ কপালে উঠবে।

গত অর্থবর্ষের শুরুতেও ভারতের তেলের চাহিদার মাত্র ০.২ শতাংশ মেটাত রাশিয়া। সেখানে সৌদি আরব, ইরাককে পিছনে ফেলে গত অক্টোবরেই ভারতে অশোধিত তেল রফতানিকারী দেশগুলির তালিকায় প্রথম স্থানে পৌঁছে গেছে রাশিয়া। আমদানি করা তেলের ৩৫ শতাংশ এখন আসছে রাশিয়া থেকে। এরপরও দেশে তেলের চড়া দামের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারের দামকে দায়ী করা যায় কি? তা হলে এক দিকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অর্ধেক হয়ে যাওয়া, অন্য দিকে রাশিয়া থেকে কার্যত জলের দামে তেল আমদানি, দু'দিক থেকে কম দামের এই যে বিরাট সুবিধা, এর কিছুই জনগণকে পেতে দেওয়া হল না। কারা পেল এই বিরাট সুবিধাটা? পেল সরকার এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলি। কী ভাবে পেল?

বেসরকারি কোম্পানিগুলি এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাশিয়া থেকে জলের দামে যে তেল কিনছে তাকে পরিস্রুত করে ইউরোপ সহ বিশ্বের নানা দেশে আন্তর্জাতিক বাজারের দামে বিক্রি করছে এবং অস্বাভাবিক হারে মুনাফা করছে। এবং শুধু রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেলই নয়, দেশে উৎপাদিত তেলও কোম্পানিগুলি দেশের বাজারে বিক্রি না করে চড়া দামে বিশ্বের বাজারে বিক্রি করছে। এই মুনাফা এতই অস্বাভাবিক যে সমালোচনার চাপে সরকার মাঝে কিছুদিনের জন্য ভারতে উৎপাদন ও রফতানির উপর এই পড়ে পাওয়া মুনাফায় 'উইন্ডফল ট্যাক্স' নামে নামমাত্র একটা কর চাপায়। কিন্তু তা-ও কমাতে কমাতে এখন প্রায় তুলেই নেওয়া হয়েছে।

তেলের দাম কমানোর প্রশ্নে তেলমন্ত্রী বলেছেন, তেল সংস্থাগুলির পুরনো লোকসান পুষিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাম কমবে। লোকসান? তেল কোম্পানিগুলির? কী ভাবে হল? তেলমন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলুন কোন বছরে, কোন সময়ে কার কত টাকা লোকসান হয়েছে। তেলমন্ত্রীর বক্তব্য, আন্তর্জাতিক বাজারে চড়া দাম সত্ত্বেও নাকি কোম্পানিগুলি দেশের বাজারে তেলের দাম বাড়ায়নি। তাই তাদের ক্ষতি হয়েছে? একই সঙ্গে তেলমন্ত্রী যোগ করেছেন, আমরা ওদের (তেল সংস্থাগুলিকে) দাম স্থির রাখতে বলিনি। ওরা নিজেরাই করেছে। এ তো রীতিমতো বিড়ালের মাছ না খাওয়ার শপথ! দেখা যাক, নিজেদের লোকসান করে তেল কোম্পানিগুলি কেমন জনসেবা করেছে?

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সর্বোচ্চ মুনাফা গড়েছে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লাভের পরিমাণ ১,৭৪৬.৯০ কোটি টাকা। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড ২০২১-২২ অর্থবর্ষে মোট লাভ করেছে ২৪,১৮৪.১০ কোটি টাকা, যা আগের বছর ছিল ২১, ৮৩৬.০৪ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রিলায়েন্স লাভ করেছে ৬০,৭০৫ কোটি টাকা। প্রায় একই হারে লাভ করেছে অন্য তেল কোম্পানিগুলিও। অথচ বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা কোম্পানিগুলির ক্ষতির গল্প শুনিয়ে বোকা বানাতে চাইছেন দেশের মানুষকে।

ফলে এ কথা স্পষ্ট যে, পুরোপুরি সরকারি মদতেই কোম্পানিগুলি এই অবাধ লুঠ চালিয়ে যেতে পারছে এবং দেশের মানুষকে বাধ্য করছে চড়া দামে তেল কিনতে যার অবধারিত ফল চড়া মূল্যবৃদ্ধি। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে এই বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দিচ্ছে এবং তার পরিবর্তে ক্ষমতার গদিতে টিকে থাকার গ্যারান্টি আদায় করছে।

এর থেকে কেউ যদি মনে করেন, এই সরকারটাকে বদলে দিলেই এই লুঠ বন্ধ হয়ে যাবে, তবে তা ভুল ভাবনা। কারণ কংগ্রেসও অতীতে এই কাজই করেছে, সিপিএম সহ অন্য দলগুলিকে নিয়ে এক সময় যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল তারাও এই কাজ করেছে। রাজ্যে রাজ্যে সিপিএম সহ যে আঞ্চলিক দলগুলি সরকার চালাচ্ছে, তারাও সবাই যে যা পারছে করের পাশাপাশি সেস, ভ্যাট চাপিয়ে নিজেদের ভাঁড়ার ভর্তি করছে। তাই তেলের চড়া দাম সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনে নাভিশ্বাস নিয়ে এলেও ভোটসর্বস্ব এই দলগুলির কারওরই তা নিয়ে এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কারণ এই দলগুলি এবং তাদের পরিচালিত সরকারগুলি সবাই পুঁজিবাদের সেবক। পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ দেখাই তাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য। এবং তা তারা দেখছে জনস্বার্থকে বলি দিয়ে। কিন্তু এই সব দল এবং সরকারগুলির এই জনবিরোধী চরিত্রকে সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ সময় খেয়ালই করেন না। করলেও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন না। জনগণের এই নিষ্পৃহতাই শাসকদের সুযোগ করে দিচ্ছে জনগণের সঙ্গে এই সীমাহীন প্রতারণার। আজ দরকার একদিকে তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে সরকারগুলিকে বাধ্য করা কিছুটা হলেও দাম কমাতে, অন্য দিকে শোষিত শ্রেণির ঐক্য গড়ে তুলে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামকে তুঙ্গে তোলা যাতে তার পরিণতিতে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী এই ব্যবস্থাকেই চিরতরে উচ্ছেদ করা যায়।

আমেরিকার ব্যাঙ্ক সঙ্কটের নেপথ্যে

সম্প্রতি আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্ক ও সিগনেচার ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্ক ক্রেডিট সুইসের আর্থিক হালও খারাপ। আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত আমেরিকার ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাঙ্কও। ব্যাঙ্কগুলির ব্যাপ্তি বিশ্বজুড়ে। সে কারণে এই ব্যাঙ্কগুলির হাল বিশ্ববাসীকে বিচলিত করেছে, সমগ্র বিশ্বকে এক গভীর আর্থিক অনিশ্চয়তার গহ্বরে টেনে নিয়ে চলেছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০০৮ সালের সেই ভয়ঙ্কর মন্দাকে, লেম্যান ব্রাদার্সের দেউলিয়া হওয়ার মধ্য দিয়ে যা সামনে এসেছিল। দু'দেশের সরকার এবং শীর্ষ ব্যাঙ্ক টাকা ঢেলে, গ্রাহকদের আমানত তোলার সুযোগ সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে যে পদক্ষেপই নিক, সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক কারণে এতে আশ্বস্ত হতে পারছেন না। সুদ বৃদ্ধি ব্যাঙ্কগুলিকে বিপাকে ফেলেছে। সুদ বৃদ্ধি ব্যাঙ্কের দায় তথা লায়াবিলিটিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায় সুদ বৃদ্ধি ছাড়া ব্যাঙ্কগুলির কাছে আর কোনও পথ নেই। তবে কেবল সুদ বৃদ্ধি নয়, অনুমান করা যেতে পারে, এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ। ঋণদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মানা হচ্ছে না। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বলতে ঋণ পরিশোধ হওয়ার মতো পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, সব রকম যাচাই এবং তাকে ভিত্তি করে বিচক্ষণতার সাথে ঝুঁকির পরিমাপ করে ঋণ দেওয়া। শুধু ঋণ দেওয়া নয়, ঋণ দেওয়ার পর তার গতিপ্রকৃতির সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণও ঋণদান প্রক্রিয়ার অন্যতম কাজ। এসব মানা হচ্ছে না বিশ্বজুড়ে। পর্যাপ্ত এবং দক্ষ কর্মীর অভাব, সরকারের নানা নির্দেশ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা এবং আরও এ জাতীয় কিছু সমস্যা এসব ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে কাজ করছে। এসব না মানার ফলে ঋণ পরিশোধ হচ্ছে না এবং ব্যাঙ্কের দায় ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্ককে সঠিক পথে চালাতে গেলে চাই সম্পদ বা অ্যাসেট এবং দায়ের যথাযথ মেলবন্ধন। উপযুক্ত বা কার্যকরী সম্পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই দায় সামলানোর পরিবর্তে দায় সামলাতে ব্যাঙ্কগুলি শেয়ার বিক্রি করছে। এতে মূলধন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দায় থেকে সাময়িক সুরাহা মিললেও বস্তুত দায়ের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সম্পদ এবং দায়ের মধ্যে সমতা রক্ষা হচ্ছে না। এরই পরিণামে দুর্বল হতে হতে ডুবছে ব্যাঙ্কগুলি।

এ কেবল আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বেই কম-বেশি এই সমস্যা ব্যাঙ্ক শিল্পকে ভোগাচ্ছে, বিপন্ন করে তুলছে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সব ব্যাঙ্কেই বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী ঋণ। ঋণদান প্রক্রিয়ার গলদ ছাড়া এ সমস্যা এমন দানবীয় আকার নিতে পারে না। আবার এসব অনাদায়ী ঋণ আদায় বা অনুৎপাদক সম্পদ কমানোর ব্যাপারে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না ঋণগ্রহীতা পুঁজিমালিকদের স্বার্থে। এ সব কারণে ব্যাঙ্কগুলি ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে এবং তা সামাল দিতে কখনও সরকারি কোষাগার থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনও শেয়ার বিক্রি করে ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে। এখন আবার ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা চলছে। এ সব পদক্ষেপ সমস্যা সমাধানের কোনও স্থায়ী সমাধান নয়।

সরকারি কোষাগার থেকে টাকার জোগান দিয়ে রুগ্ন ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অত্যন্ত আপত্তিজনক। কারণ সরকারের রাজস্ব হল জনগণের কাছ থেকে করের মাধ্যমে আদায়ীকৃত অর্থ, যা এ ভাবে ব্যয় করা কোনও যুক্তিতেই দাঁড়াতে পারে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেয়ার বিক্রি করা হচ্ছে। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ব্যাঙ্কগুলিকে কার্যত বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বেসরকারিকরণের অর্থ হল সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ যা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা আছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যার সম্মিলিত পরিমাণ বর্তমানে ১,০০,০০০,০০ কোটি টাকার কাছাকাছি—তার নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে এ দেশের ধনকুবেরদের হাতে। বেসরকারি ব্যাঙ্কের ইতিহাস সকলের কমবেশি জানা। এ নিয়ে বহু আলোড়ন সৃষ্টিকারী গল্প-উপন্যাস-সিনেমাও হয়েছে। গত শতকে দেশের বহু বেসরকারি ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বলেছে। ১৯১৩ থেকে ১৯৬৮ এর মধ্যে এ দেশে মোট ২১৩২টি ব্যাঙ্ক ফেল করেছিল। এতে ডুবে যাওয়া ব্যাঙ্কের গ্রাহক এবং কর্মচারীরা পড়েছেন অথৈ জলে। ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য সফল করবে না। উল্টে এতে শাখা ও কর্মচারী সংখ্যা কমবে এবং গ্রাহক পরিষেবা দুর্বল হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কেবল ব্যাঙ্ক পরিচালকদের বিচক্ষণতা দিয়ে সবটা সামলানো যায় না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমগ্র পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া আজ গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই সমস্যার বেড়াজাল থেকে সহজে বেরোতে পারে না।

ভারতীয় মূল্যায়ন সংস্থা 'ক্রিসিল'-এর পরামর্শ অনুযায়ী নানা পদক্ষেপ, বিশ্বজুড়ে এ জাতীয় নানা টোটকা-কবিরাজিও আজ এই ভয়ঙ্কর সমস্যা সমাধানের যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত কোনও পথ দেখাতে পারছে না। সে কারণে এই সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আজ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার প্রবীণ পার্টিকর্মী, কমরেড আজিমুদ্দিন আহমেদ শ্বাসকষ্টজনিত দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯ মার্চ ভোরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

কমরেড আজিমুদ্দিন আহমেদ ছাত্রাবস্থায় ষাটের দশকে এস ইউ সি আই (সি) দলের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে একজন পার্টিকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার সংগ্রামে যুক্ত হন। তিনি বাবা-মা, বাড়ি-ঘর ছেড়ে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের আগে ১৯৮৭ সালে তিনি দলের সদস্য পদ লাভ করেন এবং জলঙ্গী লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। একসময় তিনি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি করেন। কিছুদিন পর ফুসফুসের গুরুতর রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থায় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও দলের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে তিনি তুলনামূলক ভাবে জুনিয়র কমরেডদের অধীনে সাধ্যমতো কাজ করতে থাকেন এবং এই কাজের ধারাবাহিকতা আমৃত্যু বজায় রেখেছিলেন। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর সাথেও তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন।

ভদ্র, বিনয়ী, অকপট আচরণ ও পরোপকারী মানসিকতার জন্য তিনি এলাকায় খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। পরিবারের মধ্যেও তিনি দলের চর্চা অব্যাহত রাখেন। তাঁর স্ত্রী দলের লোকাল সাংগঠনিক কমিটির সদস্য এবং একমাত্র পুত্র দলের সমর্থক। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বহু মানুষ তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড আজিমুদ্দিন আহমেদ লাল সেলাম

অথরিটিকে লঘু করার অর্থ

একের পাতার পর

এ জিনিস কোনও দিন কোনও বিপ্লবী পার্টি চিন্তা করতে পারে না। ফলে, ব্যক্তিপূজা বা যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে অথরিটিকে হেয় করার, লঘু করার কোনও প্রবণতা বা চিন্তাকেই সমর্থন দূরের কথা, বিন্দুমাত্র লঘু করে দেখা চলে না। আমি যদি আমার কোনও আলোচনার ধরন, কোনও প্রশ্ন তোলার ধরনের দ্বারা পার্টি অথরিটিকে খাটো করে ফেলি, তবে তার দ্বারা আমি গুরুতর অন্যায় ও অপরাধ করব। কোনও বিপ্লবী পার্টি সেটা মেনে নিতে পারে না, মেনে নেওয়া উচিত নয়। এখানেই হচ্ছে সীমারেখা।

পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যে কোনও বিষয়ে আলোচনার, তর্কাতর্কির ব্যাপক অধিকার পার্টি একজনকে দেবে। কিন্তু, এই ব্যাপক কথাটার মানে সব সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া নয়। সেখানে সীমাটা হচ্ছে, কেউ আলোচনার নামে অথরিটিকে খাটো করতে পারেন না। অথরিটি সম্পর্কে উপলব্ধিটা কোথাও যান্ত্রিক হচ্ছে মনে করলে, তা নিয়ে কেউ আলোচনা করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্নটা হবে সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ যে জায়গায় তিনি মনে করছেন, উপলব্ধিটা যান্ত্রিক হচ্ছে, তিনি সে জায়গাটা দেখিয়ে বলবেন, এই জায়গাটার উপলব্ধি যান্ত্রিক হচ্ছে, এখানে বিষয়টা সম্পর্কে বোঝা সঠিক হয়নি বলেই এটা হচ্ছে, বিষয়টা এভাবে বোঝা হলে যান্ত্রিক হত না। প্রশ্নের উত্থাপনাও এ ভাবে হবে, তবে তার দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনও উপকৃত হবে। কিন্তু প্রশ্ন ও আলোচনা যদি বড় কথার আড়ালেও এমনভাবে তোলা হয়, যার দ্বারা অথরিটি সম্পর্কেই প্রশ্ন এসে যেতে পারে, তবে তাতে কোনও মতেই সম্মতি দেওয়া যায় না। দিলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়, ক্রুশ্চেভের মতো শোধনবাদীদের হাতে পড়ে যেটা সাম্যবাদী আন্দোলনে হয়ে গেল। ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নামে তারা স্ট্যালিনের অথরিটিকে খাটো করে দিল এবং তার পথ বেয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনে শোধনবাদের সিংহদরজা খুলে দিল।

লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের মধ্য দিয়েই লেনিনবাদ সঠিক ও সুনির্দিষ্ট উপলব্ধির রাস্তা পেয়েছিল। ক্রুশ্চেভরা সেটাকে ধ্বংস করে দিল। এর ফলে লেনিনের মূল সিদ্ধান্তগুলো যার যেমন খুশি ব্যাখ্যা করার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, পরিণামে আদর্শগত ক্ষেত্রে শোধনবাদ-সংস্কারবাদের অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দেওয়া হল। না হলে, অনেক দেশেই কমিউনিস্টদের আত্মদান ছিল, সংগ্রাম ছিল, কাজকর্ম ছিল, অগ্রগতি ছিল। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল। তারপর একটা বিরাট সময় ধরে কেবলই পিছনে হটে এল। অন্ধকার যুগ নেমে এল কমিউনিস্ট আন্দোলনে। ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে ক্রুশ্চেভরা সর্বনাশ করে দিল। ব্যক্তিপূজাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা অত সোজা নয়। তার জন্য ব্যক্তিপূজাবাদের জন্ম নেওয়ার মূল কারণটা জানতে হয়। এসব কথা ক্রুশ্চেভরা চিন্তা করেনি। তারা স্ট্যালিনকে খাটো করার দ্বারা সাম্যবাদী আন্দোলনে অথরিটির সমগ্র ধারণাকেই ধ্বংস করে দিল।

স্ট্যালিন নিছক একজন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন অথরিটি ধারণার মূর্তরূপ। স্ট্যালিন সম্পর্কে জনসাধারণের ভূমিকার প্রশ্নটা কীসের সঙ্গে জড়িত? স্ট্যালিনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা গৌরবময় স্মৃতি। তাঁর নামের সঙ্গে, তাঁর মর্যাদার সঙ্গে, তাঁর অথরিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা ব্যাখ্যা, যা জানার জন্য মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে হলে স্ট্যালিনের দেখানো পথেই যেতে হবে, কোনও ধারণার ঠিক-বেঠিক বিচার স্ট্যালিনের দেওয়া মানদণ্ডেই করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষের ও কমিউনিস্টদের এই মানসিকতাকেই ধ্বংস করে দেওয়া হল স্ট্যালিনকে মসীলিপ্ত করে, তার অথরিটিকে বিলুপ্ত করার মধ্য দিয়ে।"

'বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতিই মার্ক্সবাদী বিজ্ঞান'
বই থেকে

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

তিলজলায় নাবালিকা খুন
অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি
এসইউসিআই(সি)-র

কলকাতার তিলজলায় নাবালিকার যৌন নির্যাতন ও নৃশংস খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ধৃত বিক্ষোভকারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী ২৭ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, সাত বছরের শিশুকে নৃশংসভাবে খুনের বিরুদ্ধে জনরোষেরই প্রকাশ ঘটেছে আজকের বিক্ষোভের ঘটনায়। যেভাবে পুলিশ কর্তব্যে গাফিলতি করেছে তাতে এই গণবিক্ষোভ অস্বাভাবিক নয়। বারবার থানায় জানানো সত্ত্বেও কর্তব্যরত পুলিশ কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। পরে পুলিশ এসে যখন দেখে যে, অভিযুক্ত অলোকের ফ্ল্যাট বাইরে থেকে বন্ধ, কিন্তু ভেতর থেকে তার গলা শোনা যাচ্ছে, তখনও পুলিশকর্মীরা তালা ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢোকার কোনও চেষ্টা করেননি। পুলিশ যদি ঠিক সময়ে উদ্যোগ নিলে হয়ত শিশুটিকে বাঁচানো যেত।

আমরা দাবি জানাচ্ছি— ধৃত অপরাধী এবং ঘটনায় অভিযুক্ত তান্ত্রিককে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যে সমস্ত পুলিশকর্মী কর্তব্যে অবহেলা করেছে তাদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া সাধারণ মানুষদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং তান্ত্রিকদের এই ধরনের মধ্যযুগীয় কার্যকলাপ চিরতরে নির্মূল করতে সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কমরেড প্রবোধ পুরকাইতকে
শ্রদ্ধা জানাতে চুপড়িঝাড়ায় জনসমাগম

২৭ মার্চ কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের মরদেহ কুলতলির চুপড়িঝাড়া এসইউসিআই(সি) অফিসে পৌঁছালে শত শত কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা জানান। ওই দিন চুপড়িঝাড়াতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়

ধর্মঘটের জন্য শাস্তি প্রমাণ করে, সরকার ভয় পেয়েছে

বকেয়া ডি এ প্রদান, শূন্য পদে স্বচ্ছ নিয়োগ ও অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ী করার দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকে ১০ মার্চ ধর্মঘট ঐতিহাসিক ভাবে সফল করার জন্য রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারী সহ শিক্ষকদের শাস্তিমূলক বদলি ও হাজার হাজার কর্মীকে শো-কজ করছে। তার প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস ২৬ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্মঘটের পর সরকার ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত তিনটি দাবি না মেনে ধর্মঘটী সরকারি কর্মচারী সহ শিক্ষকদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে শাস্তিমূলক বদলি ও শোকজ করছে, যা শুধু অগণতান্ত্রিক নয়, স্বৈরাচারের নামান্তর। সরকারের এই পদক্ষেপ প্রমাণ করছে, সরকার এই আন্দোলনকে ভয় পেয়েছে। এআইইউটিইউসি সরকারের এই প্রতিহিংসামূলক আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। তিনি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশের সকল নাগরিকের মতামত প্রকাশ, আন্দোলন গড়ে তোলা ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘট করার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। সরকার ও সরকারি দলের ভীতি প্রর্দশন ও হুমকি উপেক্ষা করে এই ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠন সংগ্রামরত সকল ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক সহ সরকারি কর্মচারীদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

ধর্মঘট করার জন্য কর্মচারীদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস।

তিস্তা ও জলঢাকার জলের
সুষ্ঠু বন্টনের দাবি বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র

তিস্তা ও জলঢাকা নদীর জল দুটি খাল কেটে ঘুরিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যবহারের যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছে তাতে তিস্তা নদী বাংলাদেশে পুরোপুরি জলশূন্য হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী)-র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা। ২১ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন, এমনিতেই ভারতের গজলডোবা বাঁধের কারণে শুষ্ক মরসুমে তিস্তাতে জল কমে যায়। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তিস্তা নদী বর্ষার তিনমাস ছাড়া বাকি সময় জলশূন্য হয়ে পড়বে। তাঁদের আশঙ্কা, বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলা দিয়ে প্রবাহিত ধরলা নদীও তিস্তার মতোই শুকিয়ে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সেচব্যবস্থা চরম দুর্গতির মুখে পড়বে। বাংলাদেশের 'তিস্তা সেচ প্রকল্প' অকার্যকর হয়ে পড়া, ধরলা, ঘাঘট, যমুনেশ্বরী, আখিরা, দুধকুমার, বুড়ি তিস্তাসহ প্রায় ৩৩টি ছোট বড় নদ-নদীতে জলাভাবের জন্যও বাসদ (মার্ক্সবাদী) ভারত বাংলাদেশের মধ্যে তিস্তার জলবন্টন নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ন্যায্য চুক্তি না হওয়াকে দায়ী করেছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লিগ সরকারের কাছে বাসদ (মার্ক্সবাদী) বলেছে, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ৫৭টি অভিন্ন নদীর ৫৪টিই এসেছে ভারত থেকে। ফলে দু'দেশের মধ্যে নদীর জলের ন্যায্য বণ্টন, সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান, বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ, জনগণের বাধাহীন যাতায়াত এসব সমস্যা নিয়ে জনস্বার্থের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় আলোচনা ও উদ্যোগ গ্রহণ ছিল অত্যন্ত জরুরি। অথচ বাংলাদেশ সরকার নরম সুরে উদ্বেগ প্রকাশ ও দিল্লিকে চিঠি দেওয়ার গতানুগতিক দায়সারা তৎপরতাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে। তাঁদের দাবি, তিস্তার মতো একটি আন্তর্জাতিক অভিন্ন নদীর জল কোনও দেশ একতরফাভাবে আটকাতে বা তুলে নিতে পারে না। এ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনও বাংলাদেশের পক্ষে যায়। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লিগ সরকার সহ সব শাসকগোষ্ঠীর সব সময় প্রচেষ্টা থেকেছে জনগণের এসব সমস্যাকে সামনে রেখে নিজেদের লাভালাভ, পারস্পরিক লেনদেন, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। বিবৃতিতে বাসদ (মার্ক্সবাদী) বলেছে, 'বর্তমান সময়ে এর প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্টকরিডোর, রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়, এবং সর্বোপরি ক্ষমতায় থাকা ও যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত।' তাঁরা বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত ফোরামকে পাশ কাটিয়ে গোপন দ্বিপাক্ষিক লেনদেন নির্ভর আলোচনায় শাসকদের বিশেষ আগ্রহের এক জাজ্বল্যমান উদাহরণ হল জাতিসংঘ জলপ্রবাহ সনদে (ইউএন ওয়াটার কোর্সেস কনভেনশন, ১৯৯৭) বাংলাদেশের স্বাক্ষর না করা।' কনভেনশনের সাত নম্বর ধারা উল্লেখ করে কমরেড মাসুদ রানা বলেছেন, ভারত আন্তর্জাতিক অভিন্ন নদী থেকে জল তুলে নিচ্ছে, ফলে তারা এই কনভেনশনে সই করতে রাজি নয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের সরকার কেন সই করল না? তাতে বাংলাদেশ জলের দাবি জোরালো ভাবে তুলতে পারত। নদীর জল সহ সমস্ত বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে জাতীয় স্বার্থ আদায়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়গুলো উত্থাপন করার দাবি সরকারের কাছে জানিয়েছে বাসদ (মার্ক্সবাদী)।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
এ আই ইউ টি ইউ সি-র

এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ২১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, কয়েকটি সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে সংযুক্তির মধ্য দিয়ে ৫টিতে নামাতে চাইছে। এর পক্ষে সরকারের যুক্তি — এর ফলে ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতার ধার বাড়বে। বিশালাকায় বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির সাথে তারা প্রতিযোগিতায় সক্ষম হবে এবং বেশি মুনাফা করবে। এই যুক্তিতেই বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কিছুদিন আগে ২৭টি থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২টিতে নামিয়েছে।

বাস্তব হল, পুঁজিবাদের নিয়মই হল একচেটিয়া পুঁজির আর্থিক শক্তিকে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করা। এই কারণেই একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংযুক্তিকরণ অথবা বন্ধ করার এই পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণের পথও সুগম হবে। সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিই একচেটিয়া মালিক ও কর্পোরেটের হাতে চলে যাবে। ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের ফলে মারাত্মক হারে কর্মীসংকোচন ঘটবে, বহু কর্মচারী চাকরি হারাবেন। আমানতকারীরা তাঁদের কষ্টার্জিত সঞ্চয় হারাবেন। এ কারণেই এখনই এই চেষ্টা প্রতিরোধ করা দরকার। সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী, গ্রাহক, এবং জনসাধারণের কাছে এ আই ইউ টি ইউ সি আহ্বান জানিয়েছে, একচেটিয়া মালিকদের হীন স্বার্থ সিদ্ধি করার লক্ষ্যে পরিচালিত এই ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com